যুগান্তর

তারিখ ... 15 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে, বিশ্বের উষ্ণায়ন হচ্ছে— এ বিষয়টি বিশ্বের শক্তিধর ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বাস করেন না। এমনটি জেনে গোটা বিশ্ব স্তম্ভিত হলেও বিষয়টি একবারেই উড়িয়ে দেয়ার নয়। বাংলাদেশের একটি গ্রামের স্কুলের শিশুও আজ বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে, তার খুঁটিনাটি না জানলেও একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পেয়ে থাকে। হয়তো উপনিবেশ থেকে পাওয়া আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ইংরেজির প্রসারের ফলে এটি আমাদের ভালো অর্জন। আমেরিকার শিশুদের কথা না হয় বাদই দিলাম। শুনেছি আমেরিকায় এখনও কিছু মানুষ আছে— তারা বিশ্বাস করে না যে, আমেরিকা ১৯৪৫ সালে জাপানে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে প্রচুর প্রাণহানি ঘটিয়েছিল। সেভাবেই তাদের মনের ভেতর একটা স্টেরিওটাইপ তৈরি হয়ে আছে, যেটি বিশ্ব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে থাকে। ফলে গোটা বিশ্ব কোথায় গেল, কী হল— এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইয়েমেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিদিন হাজার হাজার শিশুর অসহায়ের মতো মৃত্যু হলেও সেটি আমেরিকানদের মনে প্রভাব বিস্তার করে না। সব আমেরিকানরাই কি এক রকম? মোটেই নয়; কিছু তো ব্যতিক্রম আছেই।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যে বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোলে কিছুটা দুর্বল, সেটি খবরের কাগজ কিংবা ইন্টারনেট ঘাঁটলেই জানা যায়। মাঝে মধ্যে তার উদ্ভট বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করে। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী সাংবাদিক ডেভিড পার্লম্যান ৯৮ বছর বয়সে তার কর্মজীবনের ইতি টেনে বলেছেন, আমেরিকায় এখন বিজ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। নোয়াম চমস্কি তো প্রায়ই বলেন, আমেরিকায় মানুষের বাস্তব চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবার অবকাশ নেই, ইচ্ছাও নেই। কর্পোরেট পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একদিকে তাদের সস্তা অনৈতিক আনন্দ সরবরাহ করছে, অন্যদিকে জীবনকে করে রেখেছে সীমাবদ্ধ। কর্পোরেট সিস্টেমের তৈরি স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যাওয়ার সুযোগ জনগণের আর তেমন হয় না। গোটা বিশ্বে আমেরিকা নির্লজ্জভাবে যা করছে, তার প্রতিবাদ আমেরিকায় বড় আকারে তেমন একটা দেখা যায় না। সানফ্রান্সিসকো ক্রনিকেলের সাংবাদিক ডেভিড পার্লম্যান বলেন, সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ছাপা এবং অনলাইন সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞান শিক্ষায় সচেতনতার গুরুত্বও আসে একইভাবে সংবাদপত্র থেকে। অল্পদিন আগে আমেরিকাতেই Yougov নামক একটি সংস্থার পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, সেখানে নাকি ৫৩ শতাংশ মানুষ বিশ্ব সম্পর্কে, বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী। তাহলে বাকি ৪৭ শতাংশ? সেটি অবশ্যই বলা বাহুল্য। সত্তর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটেনের মানুষকে নির্লিপ্ত থাকতে দেখে বার্ট্রান্ড রাসেল (সমাজ সম্বন্ধে তার হিউমারাস কথাবার্তা বেশ প্রসিদ্ধ) স্কটল্যান্ডের কোথাও এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ব্রিটেনের ৫০ শতাংশ মানুষ নির্বোধ, না হলে তারা রাস্তায় নামছে না কেন? উপস্থিত শ্রোতাদের অসন্তোষভাব বুঝতে পেরে তিনি বললেন, আমার একটু ভুল হয়েছে; আসলে ব্রিটেনের ৫০ শতাংশ মানুষ বোধসম্পন্ন। সবাই খুশি। মানুষের চিন্তা-ভাবনায় যখন গভীরতার সংকট দেখা দেয়, তখন এমনটিই হয়।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য নয়। যার জন্য দরকার জাতীয় নীতি এবং অর্থ। শিক্ষা খাতে আমাদের অর্থের জোগান থেকে বোঝা যায়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সৃজনশীলতা কোথায় যাচ্ছে! আমরা যতই বলি জনসংখ্যা বোঝা নয়, সম্পদ— এ স্লোগানের সঙ্গে জাতীয় নীতির সম্পর্ক থাকতে হবে।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অনেক কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে কোথাও মানসম্পন্ন শিক্ষার অস্তিত্ব পাইনি। আর বিজ্ঞান শিক্ষা? সেটির অবস্থা ভয়াবহ। ক্লাসরুম আছে তো ল্যাব নেই। ল্যাব আছে তো উপকরণ নেই। কলেজ আছে তো ভালো শিক্ষক নেই। যে প্রজন্ম এখন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে, আগামী ২০ বছর পর তারাই রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক। কত বিপদ আমাদের সামনে! আমি শুধু বিজ্ঞান শিক্ষার কথাই বলছি না, বলছি মানুষের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বা বিজ্ঞান মনস্কামিতাও, যার সঙ্গে সমাজের সার্বিক সৃজনশীলতা সম্পৃক্ত। সম্পৃক্ত যুক্তিবাদী চিন্তা, পরস্পর সহনশীলতা এবং দেশের প্রতি কমিটমেন্ট। একসময় পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার ছিল; সেখানে আমরা দলে দলে বই পড়তে যেতাম। পাড়ায় পাড়ায় বিজ্ঞান ক্লাবও ছিল। এখন শুধু ইন্টারনেট, কম্পিউটার এবং হিন্দি সিরিয়াল। প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের অভাব এবং সময়ের সীমাহীন অপচয়ের প্রভাব আগামী দিনে আমাদের দেশের ওপর পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পৃথিবীজুড়ে মৌলিক মননশীল চিন্তার এ ঘাটতি আচমকাই। তাই সন্দেহ হয়, এটি কি যুগের পরিবর্তন— না মনুষ্যসৃষ্ট? আমাদের দেশে এখন আর সত্যেন বোস বা জগদীশ চন্দ্রের আশা করছি না। আশা করছি উন্নত বিশ্বে ভ্যালু আডেড কাজের সেক্টরগুলোয় শ্রমিক সরবরাহটা যেন যুগোপযোগী হয়। অন্তত সেটিও যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি, তবে আমরা এ শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে কী করব? শুধু আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। পত্রিকায় দেখি, স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির হার কম, আবার ঝরেও পড়ছে বেশি। কর্মমুখী শিক্ষার নামে মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল এখানেই। আমরা বুঝতে পারছি না, মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কমিয়ে কর্মমুখী শিক্ষা টেকসই হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির উঠে দাঁড়াতে সময় লেগেছিল মাত্র ১০ বছর। যুদ্ধে বাড়িঘর, যন্ত্র, ফ্যাক্টরি সব ধ্বংস হয়ে গেলেও বুদ্ধি ধ্বংস হয়ে যায়নি। বুদ্ধি, দৃঢ়তা, সততা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল তাদের মাথার ভেতরে, যেটি ব্যবহার করে উঠে দাঁড়াতে তাদের সময় লাগেনি।

যারা এর মধ্যেই সৃজনশীল ও যোগ্য, তাদের উন্নত বিশ্বে যাওয়া ছাড়া গতি কী? আমাদের দেশে যে কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এখন শুধু রাজনৈতিক যোগ্যতাই কাজ করে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সত্যিকার দক্ষতার কোনো গুরুত্ব নেই। আশাহত মেধাবীরা বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশে অথবা যোগ দিচ্ছে দেশের ভেতরে কর্পোরেট সেক্টরে ভালো কোনো চাকরিতে। এটিও পরোক্ষভাবে উন্নত বিশ্বকে সেবা দেয়ার আরেক মাধ্যম। এর ফলে কর্পোরেট সেক্টর (যার বেশিরভাগই মাল্টিন্যাশনাল) দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ওপর বৈশ্বিক কর্পোরেট ব্যবস্থার পশ্চিমা প্রভাব নিয়ে আসবে, তা কি আমরা ভাবছি?

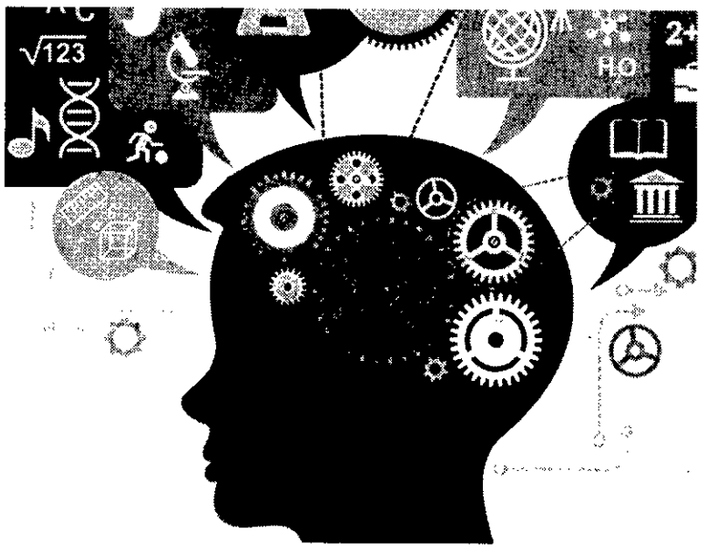

পৃথিবীজুড়ে মৌলিক মননশীল চিন্তার এ ঘাটতি আচমকাই। তাই সন্দেহ হয়, এটি কি যুগের পরিবর্তন— না মনুষ্যসৃষ্ট? আমাদের দেশে এখন আর সত্যেন বোস বা জগদীশ চন্দ্রের আশা করছি না। আশা করছি উন্নত বিশ্বে ভ্যালু আডেড কাজের সেক্টরগুলোয় শ্রমিক সরবরাহটা যেন যুগোপযোগী হয়। অন্তত সেটিও যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি, তবে আমরা এ শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে কী করব?

ড. রকীব আহমদ

সৃজনশীল চিন্তা ও বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব কি হারিয়ে যাচ্ছে?

ড. রকীব আহমদ : *প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*
raquib_ahmed@yahoo.com